বুলেটিন নং: ৩০
বর্ষ ১০। সংখ্যা ৫
প্রকাশ কাল: ৩ নভেম্বর ২০০৪
শুভেচ্ছা মূল্য: ৮ ৫ । ৮২

ইউপিডিএফ এর ওয়েবসাইট
www. updfcht.org
Email: updfcht@yahoo.com

স্বাধিকার

THE SWADHIKAR

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না: পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন চলবেই

১৩ অক্টোবর ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রথম শহীদ ভরদ্বাজ মুনির ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৯২ সালের এ দিনে তিনি দিঘীনালায় সেনা-সেটলারদের যৌথ হামলায় প্রাণ হারান। তিনি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ আয়োজিত সমাবেশে যোগদান করতে নিজ বাড়ি থেকে দিঘীনালা সদরে আসছিলেন। এর পর থেকে প্রতি বছর তার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের দেশপ্রেমিক লড়াকু সংগঠনগুলো দিনটি পালন করে আসছে।

ইউপিডিএফ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন এবারে ১৩ অক্টোবর শহীদ ভরদ্বাজ মুনির মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে দিঘীনালার বাবুছড়ায়। এ উপলক্ষে মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কয়েক শত নারী পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে অংশগ্রহণ করেন।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অলকেশ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ এর দিঘীনালা ইউনিটের নেতা সম শান্তি চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা। সভা পরিচালনা করেন পিসিপির সহসাধারণ সম্পাদক সর্বোত্তম চাকমা।

বক্তারা শহীদ ভরদ্বাজ মুনির স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, যারা তার রক্তের সাথে বেঈমানী করেছে, যারা বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে সরকারের কাছে বন্ধক দিয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবে না।

তারা বলেন, চুক্তির নামে আন্দোলন বিকিয়ে দিয়ে জনসংহতি সমিতির কিছু নেতা সরকারের কাছ থেকে আঞ্চলিক পরিষদের গদি ও সুযোগ সুবিধা পেলেও, সাধারণ জনগণ কিছুই পায়নি। অথচ গত দুই দশকের আন্দোলনে সবচেয়ে সাধারণ জনগণকেই বেশী মূল্য দিতে হয়েছে। অন্য অনেক এলাকার মতো দিঘীনালার জনগণকেও ভারতে কষ্টকর শরণার্থী জীবন কাটাতে হয়েছে। নানাভাবে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। দুঃখের বিষয়, জনসংহতি সমিতির নেতারা কেবল আন্দোলন বিকিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হননি। তারা সরকারের আশ্রয়ে থেকে জনগণের ওপর ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত চাপিয়ে দিয়েছেন। সেনাবাহিনীর চাইতেও নৃশংসভাবে নিজের জনগণের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন। ইউপিডিএফ-সহ জনগণের সকল স্তরের জনগণের বারংবার আহ্বান সত্ত্বেও তারা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করছেন না, ঐক্য ও সমঝোতার জন্য আলোচনার টেবিলে আসছেন না। সাধারণ জনগণের প্রশ্ন, জেএসএস নেতাদের যদি সত্যিই দেশপ্রেম জাতপ্রেম থাকে, তারা যদি সত্যিই জনগণের মঙ্গল চান, তাহলে তারা কেন জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে ইউপিডিএফ-এর সাথে সমঝোতায় আসছেন না। তারা যদি নির্বাচনসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিএনপি, জামাত, আওয়ামী লীগ - এসব দলগুলোর সাথে আলোচনা ও সমঝোতা করতে পারেন, তাহলে কেন তারা ইউপিডিএফ-এর সাথে সমঝোতা করতে এগিয়ে আসতে পারেন না। এখানে রহস্যটা কি? আসলে জেএসএস আন্দোলনে এক সময় প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করলেও, চুক্তির পর সেই ভূমিকা আর তাদের নেই। আঞ্চলিক পরিষদের গদি টিকিয়ে রাখার জন্যই তাদেরকে এখন সরকারের লেজুড়বৃত্তি করতে হয়। সরকারের মন জুগিয়ে চলতে হয়। কিছুদিন আগেও জেএসএস নেতারা চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলতেন, লোকদেখানো আন্দোলনও করেছেন খানিকটা। এখন তারা চুক্তি বাস্তবায়নের কথাও বেমালুম ভুলে গেছেন। আঞ্চলিক পরিষদে থেকেও তারা কিছুই করতে পারছেন না, কেবল বেতন ভাতা, ও অন্যান্য সরকারী সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নিচ্ছেন। যারা সরকারের এসব সুবিধা ছাড়তে পারে না, যারা সরকারের নুন খায়, তারা কিভাবে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে? তাদের আন্দোলনের কথাবার্তায় যারা বিশ্বাস করে তারা হয় নিরেট বোকা, গণ্ডমূর্খ; নতুবা চরম ধান্ধাবাজ।

বক্তারা জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে দালালির পথ পরিহার করে জনতার আন্দোলনের কাতারে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করলে, সরকারের কোলে আশ্রয় নিলেও রক্ষা পাওয়া যাবে না। সরকার সবসময় দুধ কলা মাখন দিয়ে পুষে রাখবে না। জনগণের আন্দোলনের মুখে অতীতে যেভাবে দালালদের গদি ছাড়তে হয়েছে জেএসএস এর নেতৃবৃন্দকেও সেভাবে আঞ্চলিক পরিষদের গদি ছাড়তে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বীর জনগণ কখনোই শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবে না। বিশ্বাসঘাতকদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থান হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। কোন অপশক্তি লড়াকু জনগণকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ষড়যন্ত্রবাজ, বিশ্বাসঘাতকরা আর বিভ্রান্ত করতে পারবে না। অধিকারহারা নির্যাতিত জনগণকে আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না। ভয়-ভীতি দেখিয়েও আর তাদের দাবিয়ে রাখা যাবে না। চেঙ্গী, মাইনী, ফেনী, শঙ্খ, মাতামুহুরীর প্রমত্ত বন্যার মতো জনগণ একদিন সংগ্রামী তেজে ফুলে ফেঁপে উঠে সকল দালাল অপশক্তি ও বিশ্বাসঘাতকদের ভাসিয়ে দেবেন। অতীতে তারা যেভাবে দালাল, সরকারের চরদের শায়েস্তা করেছিলেন, সেভাবে তারা নব্য দালালদের উচিত শিক্ষা দেবেন। সেদিন তারা কড়ায় গন্ডায় সবকিছুর হিসেব নেবেন। নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেবেন। কাজেই গণশত্রুরা সাবধান।

ভরদ্বাজ মুনির আত্মত্যাগ আমাদের লড়াই সংগ্রামে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তার স্মৃতির প্রতি স্বাধিকার প্রকাশনা বিভাগের গভীর শ্রদ্ধাভিবাদন।

জুম্ম শরণার্থী নেতা নতুন কুমার চাকমার ইউপিডিএফ-এ যোগদান

ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী নেতা নতুন কুমার চাকমা গত ৭ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ইউপিডিএফ-এ যোগদান করেছেন। এ উপলক্ষে খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিট তার কার্য্যালয়ে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সমন্বয়কারী ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সচিব চাকমা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা নেতা প্রদীপন খীসা। শরণার্থী নেতা নতুন কুমার চাকমাকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেন সচিব চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী সোনালী চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অলকেশ চাকমা। অনুষ্ঠানে ইউপিডিএফ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা কর্মি উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কালোপ্রিয় চাকমা, দেবদত্ত ত্রিপুরা, শংকর চাকমা, অলকেশ চাকমা এবং সোনালী চাকমা প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ নতুন কুমার চাকমাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম বেগবান করার জন্য ইউপিডিএফ এর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাণের দাবি পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আদায়ের মাধ্যমেই কেবল ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব হতে পারে।

পার্টিতে যোগদান উপলক্ষে নতুন কুমার চাকমা তার দীর্ঘ শরণার্থী জীবনের কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, "আমি ১৯৮৯ সালের ২৩শে মে ভারতে শরণার্থী হয়েছি। পরে সেখানে থেকে ফিরে আসি ১৯৯৬ সালে। ভারতে শরণার্থী থাকাকালেই আন্দোলনের

৪র্থ পাতায় দেখুন

জনগণের মানবাধিকার নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা

লক্ষ্মীছড়িতে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যদের বর্বরতার ওপর হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরামের রিপোর্ট প্রকাশ

গত ১৪ অক্টোবর ২০০৪ মানবাধিকার সংগঠন হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে জনগণের মানবাধিকার নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা শিরোনামে এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। সম্প্রতি খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়িতে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যরা সাধারণ জনগণের ওপর যে অত্যাচার চালায় সেটাই হলো রিপোর্টটির বিষয়বস্তু। ভূমিকা, অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়, লুটপাট নির্যাতন ও হয়রানি, চাঁদা আদায়, খুন ও গুম, জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য - এই ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত রিপোর্টে মূলতঃ ঘটনার শিকার গ্রামবাসীদের কথাই হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। আমরা নিম্নে কেবলমাত্র রিপোর্টটির মূল অংশ অর্থাৎ ভূমিকা প্রকাশ করছি। কারণ এতে তদন্তকৃত দলটি তার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছে। হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম রিপোর্টটির ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশ করেছে। আগ্রহীরা রিপোর্টটির কপি পেতে হলে নিম্নের ইমেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারবেন: hwhrf_99@yahoo.com

ভূমিকা: এ বছর মে মাসের দিকে ১৪-১৫ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়িতে এসে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাতে থাকে। পরে এক সময় জনগণ অতীষ্ট হয়ে তাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললে তারা এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু এর কিছু দিন পর অন্য একটি সশস্ত্র গ্রুপ (সংখ্যায় ৩৫ জন) ঐ এলাকায় এসে হাজির হয়। তারা দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি, দুল্যাতলি, বর্মাছড়ি, ফটিকছড়ি ও রাঙ্গামাটির কাউখালি এলাকার কিছু অংশে ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে বসে। তারা ইউপিডিএফ সদস্য সুইচিং মারমাসহ ৪ জনকে খুন করে, নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ ও তাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করে, প্রতি গ্রাম থেকে চাঁদা আদায় করে, বাড়িঘরে ও দোকানে লুটপাট চালায়, লোকজনের ঘরবাড়ি তছনছ ও সম্পত্তি ধ্বংস করে দেয়, অনেক নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায়। এলাকায় জনমনে তারা এমনভাবে ত্রাস সৃষ্টি করে বা লোকজন তাদের ভয়ে এতটায় সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত যে, একবার একজন বৃদ্ধ মহিলা কেবল বাড়ির পাশ দিয়ে তাদেরকে যেতে দেখেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান।

জনগণের উপর সশস্ত্র গ্রুপগুলোর বর্বর নির্যাতনের ঘটনা তদন্তের জন্য ঢাকা ভিত্তিক পাহাড়িদের একটি মানবাধিকার সংগঠন হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরামের একটি প্রতিনিধি দল স্বউদ্যোগে ও দায়িত্ববোধের তাড়না থেকে গত ২৪ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ঐ সব এলাকা সফর করে। তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত দলটি ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেল বেলায় বর্মাছড়ি পৌঁছে। পরদিন অর্থাৎ ২৫ তারিখ থেকে তদন্ত দলের সদস্যরা তাদের কার্যক্রম শুরু করে। ঐদিন তারা প্রথমে বর্মাছড়ি বাজার ও পরে দুলুপাড়া ও গুমুত্যাতুলিতে সশস্ত্র গ্রুপটির কথিত আস্তানা পরিদর্শন করে ও সাধারণ গ্রামবাসী ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে। এই সব সাক্ষাতকার গ্রহণের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিডিও ক্যামেরা, স্থির ক্যামেরা, মাইক্রো রেকর্ডার ও অবশ্যই নিজস্ব নোট খাতা ব্যবহার করা হয়। ২৬ তারিখ সকাল ১১টা থেকে শুকনাছড়ি, মরাচেঙে মুখ-সহ বিভিন্ন গ্রামের ক্ষতিগ্রস্তদের এক জায়গায় জড়ো করে সাক্ষাতকার নেয়া হয়। বিকেল ৫টা পর্যন্ত সাক্ষাতকার চলে। ২৭ তারিখ বটতলি, বড় পাড়া, লাবোছড়ি, টেক বাড়িয়া, কুদুকছড়িসহ আরো কয়েকটি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্তদের সাক্ষাতকার নেয়া হয়। এরপর ২৮ তারিখও বর্মাছড়ি বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের সাথে কথা হয়। সর্বশেষ বড়ইতলি, ফিত্তিপাড়া ও বাকছড়ি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্তরা সাক্ষাতকার দেন।

এভাবে সাক্ষাতকার গ্রহণের কারণ হলো প্রথমত, এলাকাটা খুবই বিস্তৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন পরস্পর বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন। তা সত্ত্বেও তদন্ত দলের সদস্যরা প্রত্যেকটি গ্রামে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন ও সাধারণ গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলতে পারলে অবশ্যই আনন্দিত হতেন। কিন্তু এত স্বল্প সময়ে সব গ্রাম পরিদর্শন করে একে একে সবার সাক্ষাতকার নেয়া সত্যিই সম্ভব হতো না। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ ২-৩ দশক ধরে তথাকথিত উন্নয়ন কার্যক্রম চালানো হলেও, খাগড়াছড়ির এই অঞ্চলটি এখনো পর্যন্ত এতটাই পশ্চাদপদ রয়ে গেছে যে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যেতে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, এলাকার লোকজন এভাবেই তদন্ত দলের কাছে তাদের সাক্ষাতকার দিতে চেয়েছিলেন। যারা দূর গ্রাম থেকে নিজের ঘরের কাজ ফেলে পাঁয়ে হেটে এসে তদন্ত দলের কাছে খোলামেলাভাবে সাক্ষাতকার দিয়েছেন আমরা তাদের প্রতি তদন্ত দলের সদস্যরা কৃতজ্ঞ।

২য় পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ❑ ২০০৪ ❑ বুলেটিন নং ৩০ ❑ ৩ নভেম্বর ২০০৪

র‍্যাবঃ দি মার্চেন্ট অব ডেথ

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব -এর সাথে "ক্রসফায়ারে" মৃত্যুর খবর প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকার পাতায় পাওয়া যাচ্ছে। ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত র‍্যাবের হাতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪২ জনে। ক্রসফায়ারে সন্ত্রাসীদের নিহত হওয়ার দাবির মধ্যে সত্যতা থাকুক আর নাই থাকুক, র‍্যাব যদি সত্যিই জনস্বার্থে গঠন করা হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তা না হলে এটা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, র‍্যাব কেবল আইনের উর্ধ্বে নয়, তারা নিজেরাই আইন, the law unto themselves. ক্রসফায়ারে মারা গেছে বললেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যেতে পারে না। দেশের রাজনৈতিকগুলো এবং সচেতন নাগরিক মহল র‍্যাব-এর কার্যকলাপের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কেউ কেউ এই তথাকথিত সন্ত্রাস-বিরোধী বাহিনীকে ভেঙে দেয়ারও দাবি জানিয়েছেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলোও অভিযোগ করেছে যে র‍্যাব দেশের সংবিধান ও আইন লঙ্ঘন করছে। তারা র‍্যাব-এর হেফাজতে ও "ক্রসফায়াসে" মৃত্যুকে এক্সট্রা-জুডিসিয়াল কিলিং বলে অভিহিত করেছে। সম্প্রতি র‍্যাব গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

প্রায় ছয় মাস আগে সন্ত্রাস দমনের উদ্দেশ্য নিয়ে র‍্যাব গঠন করা হলেও, এরা কার্যত কতটুকু সন্ত্রাস দমন করতে পারবে, নাকি তারা নিজেরাই criminals in uniform বা লাইসেন্স ধারী সন্ত্রাসী হয়ে যাবে সেটাই ভাববার বিষয়। কারণ অতীতে সন্ত্রাস দমনের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক আইন হয়েছে, সামরিক বাহিনীকে দিয়ে অপারেশন ক্লিন হার্ট হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাস আদতে দমন হয়নি। না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ জনগণের ধনসম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা বর্তমান শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্র ব্যবস্থাই হচ্ছে সন্ত্রাসী সৃষ্টির আসল কারখানা। সমাজ অপরাধ তৈরি করে রাখে, মানুষ সেই অপরাধ সংঘটন করে। কাজেই এই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিজেদের সৃষ্ট সন্ত্রাস নামক সমাজের দুষ্ট ক্ষতকে কখনোই স্থায়ীভাবে সারিয়ে তুলতে পারে না, যেমনভাবে জনগণের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে পারে না। সেজন্য পিচ্চি হান্নান "ক্রসফায়ারে" নিহত হলে তার স্থান অন্যজন পূরণ করে নেয়। কালা জাহাঙ্গীরের জায়গা দখল করে ধলো জাহাঙ্গীর কিংবা রঙ বেরঙের জাহাঙ্গীররা। এ প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

কাজেই বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া সন্ত্রাস যেমন নির্মূল করা যাবে না, তেমনি জনগণের মৌলিক সমস্যাগুলোরও কোন সমাধান পাওয়া যাবে না। "ক্রসফায়ারে" বহু সন্ত্রাসী খতম হলেও না। এটাই হচ্ছে অমোঘ সত্য।

তারপর, এই র‍্যাবকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা কিছুতেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। ইতিমধ্যে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল থেকে এ ধরনের রব উঠতে শুরু করেছে। অতীতে সন্ত্রাস দমন আইনগুলো যতটা না আসল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছিল, তার চাইতে বেশী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য অপপ্রয়োগ করা হয়েছিল। এখনো ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর কোড এর ১৪৪ ধারা ও বিশেষ ক্ষমতা আইন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সুতরাং নিকট ভবিষ্যতে র‍্যাব যদি হিটলারের গুপ্ত পুলিশ বাহিনী গেষ্টাপোর আধুনিক ও বাংলাদেশী সংস্করণ হয় তাতে অবাক হবার কিছুই থাকবে না। ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার জন্য ফ্যাসিস্টদের এ ধরনের ঘাতক বাহিনী দরকার হয়ে থাকে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সরকারের মনে রাখা দরকার, এ ধরনের ফ্যাসিস্ট ঘাতক বাহিনী দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না।

আসলে বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার যেভাবে দেশটাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশন্যালের রিপোর্ট অনুযায়ী এবারও বাংলাদেশ দুর্নীতিতে শীর্ষে রয়েছে), তাতে র‍্যাপিড এ্যাকশন দরকার হয়ে পড়েছে তাদের বিরুদ্ধেই। আওয়ামী লীগ-বিএনপি এই দ্বিদলীয় শাসকগোষ্ঠিকে উৎখাত করে প্রকৃত অর্থে জনগণের ক্ষমতা কায়েমই এখন প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির কর্তব্য।

সদ্য সমাপ্ত পৌরসভা নির্বাচন

৬ অক্টোবর খাগড়াছড়ি ও ৭ অক্টোবর রাঙ্গামাটি পৌরসভার নির্বাচন হয়ে গেলো। খাগড়াছড়িতে নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি-নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট প্রার্থী জেলা ছাত্রদল সভাপতি জয়নাল আবেদীন ও রাঙ্গামাটিতে জয়লাভ করেছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান। বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্ড গলায় ঝুলিয়ে রাখলেও এদের দু'জনের মধ্যে একটা বিষয়ে খুবই মিল লক্ষ্য করা যায়। সেটা হলো চিন্তা-চেতনায় ও আচার-আচরণে এরা দু'জনেই সাম্প্রদায়িক হিসেবে এলাকার জনগণের কাছে পরিচিত।

নির্বাচনে ইউপিডিএফ -এর কোন প্রার্থী ছিল না। তবে অসাম্প্রদায়িক ও তুলনামূলক বিচারে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি যাতে নির্বাচিত হয় সে ব্যাপারে সদয় দৃষ্টি দেবার জন্য পৌর এলাকাবাসীর প্রতি জেলা ইউনিটের পক্ষ থেকে আহ্বান ছিল। খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ-এর উদ্যোগে ৮ অক্টোবর নির্বাচন উত্তর মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে চেয়ারম্যান প্রার্থী ব্যতীত কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারীরা (বিজয়ী ও বিজিত), বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়। যেমন একই আসনে বহু প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা, যার ফলে একদিকে যেমন অনেক অর্থ অপচয় হয়, অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও বিভেদ সৃষ্টি হয় ও সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য দুর্বল হয়। ভবিষ্যতে যাতে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে এ ধরনের অনৈক্য, সমন্বয়হীনতা ও দলাদলির সৃষ্টি না হয় সেজন্য সকলের সচেষ্ট থাকা উচিত বলে সবাই একমত হন।

নির্বাচন আসলেই এক ধরনের হুজুগ সৃষ্টি হয়। অনেকে নির্বাচনকে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের অপূর্ব সুযোগ হিসেবে মনে করে। ব্যক্তিস্বার্থ এমনভাবে প্রধান হয়ে ওঠে যে তাতে আমাদের জাতীয় ও বৃহত্তর স্বার্থ চাপা পড়ে যায়। নির্বাচনকে অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিতভাবে না দেখে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা হয়। ফলে ভুলের মাশুল গুনতে হয়। আবার অনেকে দুটি তথাকথিত জাতীয় বড় দল - আওয়ামী লীগ ও বিএনপি - ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চান না। এই দলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের কাঁধে ভর করার সুযোগ পাচ্ছে প্রধানত নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই। এক্ষেত্রে অবশ্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব কম দায়ি নয়। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তারা চরম অপরিণামদর্শীতা ও রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। যে আওয়ামী লীগ পাহাড়িদেরকে বাঙালী বানাতে চেয়েছিল সেই আওয়ামী লীগকে পর পর দু'বার নিঃশর্ত সমর্থন দেয়ার ফলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। বিগত সংসদ নির্বাচনে তো জেএসএস-এর একেবারে লেজে গোবরে অবস্থা। কাজেই এসব ভুল থেকে আমাদের সবার অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে। ভবিষ্যতে সামগ্রিক স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে নির্বাচনের হিসাব নিকাশ করতে হবে। ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ ও গোষ্ঠিগত স্বার্থ দ্বারা চালিত হলে তা কারো পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না।

জনগণের মানবাধিকার নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা

১ম পাতার পর

তদন্ত দলের সদস্যদের কাছে ঘটনার শিকার লোকজন ও সাধারণ গ্রামবাসীরা যা বলেছেন তাই হুবহু এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তদন্ত দলটি বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তাদের মতামত দেয়া থেকে বিরত থেকেছে। আমরা চাই যারা এই রিপোর্টটি পড়বেন তারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে মতামত গঠন করবেন। যারা বছরের পর বছর ধরে কখনো রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে, কখনো সরকারের মদদপুষ্ট সশস্ত্র গ্রুপের হাতে অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে আসছেন, যাদের কথা এ দেশের পত্র পত্রিকায় ঠাঁই পায় না, আমরা এখানে তাদের কথাই দেশবাসী তথা বিবেকবান মানুষের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। সেজন্য আমাদের প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে অন্যান্য সাধারণ তদন্ত রিপোর্টের মতো বিবেচনা করা সঙ্গত হবে না।

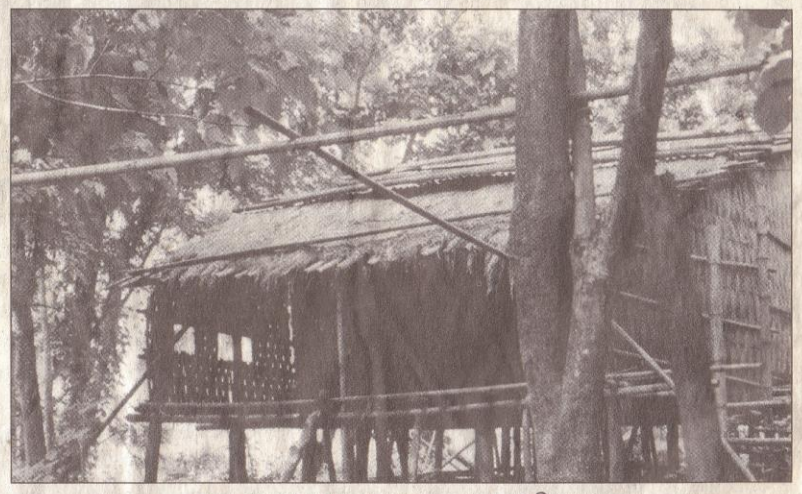

দুলু পাড়ায় সশস্ত্র জেএসএস সদস্যদের অস্থায়ী আস্তানা

তদন্ত শেষে ফিরে আসার পর পরই আমরা দ্রুত রিপোর্টটি প্রকাশ করতে চেয়েছি। কিন্তু আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নানা কারণে তা প্রকাশ করতে দেরী হয়ে গেলো। এ জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা না বললে নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সংঘাতময় পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক। ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত বহুল আলোচিত পার্বত্য চুক্তির পর যে এই অঞ্চলে শান্তি আসেনি বর্তমান পরিস্থিতি তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ। সাধারণ লোকজন আগের মতোই নির্যাতিত হচ্ছেন। জনগণের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। চুক্তিকে সমালোচনা করার কারণে রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর দমন পীড়ন চালানো হয়েছে ও হচ্ছে, তাদের সভা সমাবেশে হামলা করা হয়েছে, তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ ও বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার - এই উভয় সরকারের আমলে এসব ঘটনা ঘটেছে। চুক্তির আগে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কেবল সেনাবাহিনীকে দায়ি করা হতো। দুঃখজনক হলেও সত্য চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীর তালিকায় অন্য একটি নাম যোগ হয়েছে। তদন্ত টিমের সদস্যদের কাছে দেয়া লোকজনের সাক্ষাতকার থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে এই নামটি কার। আলোচনার সময় সাক্ষাতকার দাতারা জানান যে, জনসংহতি সমিতির এক সদস্য লক্ষ্মীছড়িতে এসে ঘোষণা দেয় যে, তিনি লক্ষ্মীছড়িতে "বুরুজ খেলা" (এক ধরনের তাস খেলা) খেলতে এসেছিলেন। "বুরুজ খেলা" বলতে তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, হয় তার দল নিশ্চিহ্ন হবে, না হয় তার বিরুদ্ধ দলকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হবে। এ ধরনের বক্তব্য দুঃখজনক। তদন্ত দলটি দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছে যে, জেএসএস এর ঐ সদস্যটির কার্যকলাপের সাথে তার এই ঘোষণা অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্রিয়াশীল অন্যান্য রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে নেয়া, সমালোচনা করার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, জনগণের মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সহিংস আক্রমণ বন্ধ করার জন্য জনসংহতি সমিতির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম এও আশা করে যে, জনসংহতি সমিতির নেতারা অবিলম্বে চলমান সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে ইউপিডিএফ-এর ঐক্য-সমঝোতা ও আলোচনার প্রস্তাবের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেবেন।

আগেই বলা হয়েছে, পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে। আগের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রচুর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। চুক্তির মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হলেও এবং সরকারের বেসামরিক প্রশাসন চালু থাকলেও, সামরিক বাহিনীই সেখানে সবকিছুর মূল নিয়ন্ত্রক (de facto ruler)। অপারেশন উত্তোরণ নাম দিয়ে মূলত সামরিক শাসনই জারী রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক ক্যাম্প গুটিয়ে আনার পরিবর্তে নতুন করে বিভিন্ন জায়গায় সেনাক্যাম্প স্থাপন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম নিজস্ব তদন্তের মাধ্যমে এইসব অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করেছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী অনেক বাগাড়ম্বর করলেও তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, যখন সশস্ত্র গ্রুপগুলো সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালায় তখন তারা সে ব্যাপারে নির্লিপ্তভাব নিয়ে থাকে। হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরামের তদন্ত দলকে জানানো হয় যে, লক্ষ্মীছড়িতে সশস্ত্র গ্রুপটি আসার পর যখন জনগণের ওপর নির্যাতন শুরু করে, তখন বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি ও বয়স্ক মুরুব্বী সেনাবাহিনীর সদস্যদের অনুরোধ করেন তারা যেন ঐ সশস্ত্র গ্রুপটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। কিন্তু সেনা সদস্যরা এতে নির্লিপ্ত ভাব দেখান ও সশস্ত্র গ্রুপটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। সেনা সদস্যদের এই ধরনের আচরণে এলাকার জনগণ ক্ষুব্ধ হন, যদিও সেনা বাহিনীর প্রতি তাদের আস্থা শুন্যের কৌটায়।

হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহারের কোন বিকল্প নেই।

হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহারের কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য চুক্তির পর বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর আত্মসমর্পন ও বিলুপ্তির প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামে এত বিশাল সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা চাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জনগণের স্বার্থে সরকার অচিরেই দুইটি উদ্যোগ গ্রহণ করুক: এক. পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা ও মানবাধিকর পরিস্থিতির উন্নতি করা এবং দুই, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার যথার্থ সমাধান ও প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার শুরু করা।

ব্যক্তিত্ব

সিমন বলিভার: দক্ষিণ আমেরিকার মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা

রবিশংকর চাকমা

দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা সিমন বলিভারের নাম অনেকের কাছে অপরিচিত হতে পারে। তাকে বলা হয় দক্ষিণ আমেরিকার মহান মুক্তিদাতা, - দি গ্রেট লিবারেটর অব সাউথ আমেরিকা। এই মহান নেতার নাম থেকেই বলিভিয়া নামের দেশটির নামকরণ করা হয়েছে। সিমন বলিভার ১৭৮৩ সালে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৬৭ সালে দে লোসাদা এই শহরটির পত্তন করেন। তারপর থেকে দুই শত বছর ধরে এই কারাকাস দক্ষিণ আমেরিকায় স্প্যানিস সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

বলিভারদের পরিবারটি ছিল খুবই ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী। তাদের ছিল বিশাল রোপ্য খনি ও ইক্ষু বাগান যেখানে ক্রীতদাসরা কাজ করতো। সিমনের পিতামহ স্প্যানিস রাজপ্রাসাদ থেকে আভিজাত্যসূচক উপাধি লাভ করেছিলেন। সিমন বলিভার পনের বছরে পদর্পনের আগেই পিতৃমাতৃহারা হন। তার মাতামহ ফেলিসিয়ানো পেলেসিয়স তাকে লালন পালন করেন ও ভেনেজুয়েলা ও স্পেনে তার সার্বিক পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন। স্পেনে থাকাকালীন তিনি পড়াশুনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। সেখানে তিনি টেরেসা ডেল টোরো নামের এক মেয়ের প্রেমে পড়েন। তখন তার বয়স মাত্র আটার ও টেরেসার বয়স সতের। এর এক বছর পর তাদের বিয়ে হয়। সিমন তাকে কারাকাসের নিকটে তাদের পারিবারিক একটি প্লান্টেশনে নিয়ে আসেন। কিন্তু খুব অল্প সময় পরে টেরেসা মেলিগন্যান্ট জ্বরে মারা যান। এতে সিমন সাংঘাতিকভাবে মর্মাহত হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি আর বিয়ে করবেন না। এই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করেছিলেন।

এরপর তিনি আবার ইউরোপে চলে আসেন। এ সময় তার পরিচয় ঘটে ফ্রানসিস্‌কো ডি মিরান্ডার সাথে। ইনি হলেন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত। কারাকাসে জন্মগ্রহণকারী এই বৃদ্ধের ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতির ওপর বিশাল পাণ্ডিত্য দেখে সিমন বলিভার মুগ্ধ হন ও তার দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি ১৮০৩ সালে আর্জেন্টিনার মুক্তিদাতা জোসে ডি সান মার্টিন ও চিলির জাতীয় বীর বার্নার্ডো ও'হিজিনস এর সাথে **কাডিজে লজ লট্রোর** সদস্য হন। এছাড়া বলিভার তার এক বন্ধু মার্কুইস ডি উজতিয়াস -এর ব্যক্তিগত বিশাল লাইব্রেরীতে পড়াশোন করেন। ব্যক্তিগত হলেও এই লাইব্রেরীতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রচুর বই ছিল।

তখনকার যুগটা ছিল সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার। এই ধারণাগুলো তখন ছিল খুবই শক্তিশালী। দি রাইট অব ম্যান বা মানুষের অধিকার শব্দগুলোর অর্থ বোঝা হতো সেই সময়কার ইউরোপে জনবিচ্ছিন্ন স্বেচ্ছাচারী শাসকদের আধিপত্যের বিপরীতে। প্যারিসে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ও গবেষক আলেক্সান্ডার ফন হামবোল্ড (Alexander von Humboldt) এর সাথে সিমন বলিভারের সাক্ষাত হয়। বলিভার তাকে তার দেশের মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে তার অনুভূতির কথা বলেন। দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে এই বিজ্ঞানীর ভালো জ্ঞান ছিল। বলিভারের কথা শুনে তিনি বললেন, "আমার মনে হয় তোমার দেশটি মুক্তির জন্য উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই বিশাল কাজের ভার নেবে কে?" বলিভার তার প্রাক্তন শিক্ষক সিমন রড্রিজেজ এর সাথে ইতালীর রাজধানী রোম সফর করেন। সেখানে একদিন সন্ধ্যায় তারা এ্যাভেনটিন পাহাড়ের চূড়ায় উঠেন। সিমন বলিভার তার সম্মুখে প্রসারিত মন্যুমেন্ট ও পুরোনো দালানের ধ্বংসাবশেষ-এর দিকে অনেক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। পরে হঠাৎ রড্রিজের দিকে মুখে ঘুরিয়ে বলে উঠলেন, "আমি তোমাকে, আমার পিতৃপুরুদের ও আমার ও আমার দেশের মর্যাদাকে সাক্ষী রেখে শপথ নিচ্ছি, - যে শিকল স্পেনের সাথে আমাদের বেঁধে রেখেছে সেই শিকল না ভাঙা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হবো না।" কথিত আছে, দুই হাজার বছর আগে এই এ্যাভেনটিন পাহাড়েই রোমানরা তাদের স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি শপথ নিতো।

বলিভার আর বেশী দিন রোমে থাকলেন না। তিনি শীঘ্রই কারাকাসে ফিরে আসেন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তখন দেশপ্রেমিক সংঘ নামের একটি দল কারাকাসে সক্রিয় ছিল। এ দলের সাথে তার দেখা হয়। তিনি দেখতে পান যে, দলটির খুবই বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং দলের সদস্যরা কিভাবে কাজ করবে সে ব্যাপারে কিছুই ধারণা তাদের নেই। বলিভার তাদেরকে বললেন, "দেখো, তোমাদের মনে যে সন্দেহ সংশয় তা হলো আমাদের পুরোনো শৃঙ্খলের বাজে ফল। আমাদের আর এই শৃঙ্খল পরার প্রয়োজন নেই। লোকে বলে কোন মহান কাজের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় শান্তভাবে। কিন্তু তিন শ' বছরের শান্তভাব কি যথেষ্ট নয়? আসুন নির্ভয়ে আমরা দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি।"

তারপর ঘটনাগুলো খুব তাড়াতাড়ি ঘটে যেতে থাকে। বলিভার ও তার প্যাট্রিয়টস দলের সদস্যরা ১৮১০ সালে কারাকাস দখল করেন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর বলিভার, আন্ড্রেস বেলো ও তাদের কয়েকজন সহকর্মি বৃটিশ সরকারের সহযোগিতা পাবার আশায় লন্ডনে যান। তখন বৃটিশ ও ফ্রান্সের শত্রুতা ছিল প্রবাদের মতো। সেজন্য তারা আশা করেছিলেন হয়তো বা বৃটিশরা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য দেবে। কিন্তু বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে তারা কেবল নিরপেক্ষতার আশ্বাস পেয়েছিলেন। অর্থাৎ স্পেনের বিরুদ্ধে তাদের যে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে তাতে বৃটেন নিরপেক্ষ থাকবে। তারা ফ্রান্সিসকো ডি মিরান্ডাকেও অনুরোধ করে নিয়ে আসেন লিবারেশন আর্মির দায়িত্বভার নেয়ার জন্য। কারণ মিরান্ডা এমন একজন বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী, আন্দোলন যাকে একজন সমর নেতা হিসেবেও গড়ে তুলেছিল। তিনি এক সময় রাইন নদীর তীরে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এখন খুবই বয়োঃবৃদ্ধ এবং ফলে গেরিলা যুদ্ধের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হলেন। তিনি বিপ্লবী যুদ্ধকে পন্ড করে দেন ও শেষে স্প্যানিস সরকারের শর্ত মেনে নেন। বলিভার তাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হন। কিন্তু ইতিমধ্যে পচন ধরতে শুরু করে এবং আন্দোলন ধ্বংস হয় ও নেতারা গ্রেফতার হন। মিরান্ডাকে বন্দী করে স্পেনে নেয়া হয়। বলিভার যদিও ১৮১৩ সালে কারাকাস পুনর্দখল করতে সক্ষম হন, কিন্তু পরে স্প্যানিস বাহিনী তাকে ভেনেজুয়েলা থেকে নিউ গ্রানাডায় (বর্তমানে কলম্বিয়া) পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে। নিউ গ্রানাডাও সে সময় স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। সেখানে বলিভার কলম্বিয়া সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বগ্রহণ করেন ও ১৮১৪ সালে বোগোটা দখল করেন। কিন্তু এই দখল তিনি বেশী দিন রাখতে সক্ষম হননি, কারণ, তাদের লোকবল ও খাদ্যসামগ্রীর ঘাটতি ছিল। ফলে তিনি দখল ছেড়ে দিয়ে প্রথমে জ্যামাইকা ও পরে হাইতি চলে যান। ভেনেজুয়েলায় তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার সংকল্পে অটল থাকেন ও স্বাধীনতার প্রতি আস্থা ধরে রাখেন।

হাইতিতে তিনি জেনারেল ম্যারিয়নের কাছ থেকে বীরের অভ্যর্থনা লাভ করেন। তিনি সেখানে গোলা বারুদ ও সৈন্য সংগ্রহ করেন। এমনকি তাকে তার সৈন্যবাহিনীতে হাইতির সৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের ভর্তি করতে দেয়া হয়। হাইতির প্রেসিডেন্ট তাকে কেবল একটি অনুরোধ জানান, তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় যে সব দেশ মুক্ত করবেন সে সব দেশে ক্রীতদাসদের যেন মুক্তি দেয়া হয়।

বলিভার তার শক্তি সঞ্চয় করে ১৮১৭ সালে আবার ভেনেজুয়েলায় ফিরে আসেন এবং এঙ্গোস্ট্রা (বর্তমানে কুইদাদ বলিভার) দখল করেন। তিনি সেখানে বিপ্লবী সরকার গঠন করেন ও ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮১৯ সালে বলিভারের সৈন্যরা বয়াকা নামক স্থানে (বর্তমান কলম্বিয়ার আন্দিজ পর্বতমালা বরাবর অবস্থিত) স্প্যানিস বাহিনীকে পরাজিত করে। এর পর ভেনেজুয়েলা ও নিউ গ্রানাডা মিলে রিপাবলিক অব কলম্বিয়া গঠিত হয় এবং বলিভার এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৮২৪ সালে বলিভার পেরুর মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং লিমা দখল করে পেরুকে স্প্যানিস আধিপত্য থেকে মুক্ত করেন। ১৮২৫ সালে তাকে পেরুর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। সেখানে তিনি দক্ষিণ পেরু বা Alto Peru-কে একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে গঠন করেন। তার প্রতি সম্মান জানিয়ে এর নাম রাখা হয় বলিভিয়া। আর কুইটো (Quito)নামক অঞ্চলটি হয় বর্তমানের ইকুয়েডর।

১৮২৭ সালে তিনি কলম্বিয়ায় ফিরে আসেন এবং ১৮৩০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এর কিছু কাল পর ১৮৩০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর কলম্বিয়ার সান্তা মারিয়ায় মৃত্যু বরণ করেন।

সিমন বলিভার ছিলেন ভেনেজুয়েলার প্রথম প্রেসিডেন্ট। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার পাঁচটি দেশকে স্প্যানিস সাম্রাজ্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন। এ জন্য তাকে লিবারেটর অব সাউথ আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন বলা হয়। তিনি একজন চমৎকার লেখক ও সুবক্তা হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। টেক্সাস থেকে মেক্সিকো প্রবেশ করলে সিমন বলিভারের যে মূর্তি দেখা যাবে যেখানে লেখা আছে: "Liberator of Americas". তার এ রকম মূর্তি সান ফ্রান্সিসকো শহরেও রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার সব দেশে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ভেনেজুয়েলা ও বলিভিয়ায় তার জন্মদিনটি জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

[ইন্টারনেটে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত ॥]

এনজিওগুলো হলো আধুনিক যুগে ধর্মনিরপেক্ষ মিশনারী

অরুন্ধতী রায়

[১৬ আগষ্ট ২০০৪ ভারতীয় লেখিকা অরুন্ধতী রায় আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রানসিসকোতে আমেরিকান সোসিওলোজিক্যাল এসোসিয়েশনের ৯৯তম বার্ষিক সভায় উপচে পড়া জনতার উপস্থিতিতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কনফারেন্সের বিষয়বস্তু ছিল "Public Sociologies". তার বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও রেডিওতে সম্প্রচার এবং ই-মেইলের মাধ্যমে সারা বিশ্বব্যাপী বিলি করা হয়। ভারতের Frontline ম্যাগাজিনের অক্টোবর ৯ - ২২, ২০০৪ সংখ্যায় "Public Power in the Age of Empire" শিরোনামে প্রকাশিত তার এই দীর্ঘ বক্তৃতা থেকে এখানে এনজিও সম্পর্কিত অংশটি অনুবাদ করে ছাপানো হলো। - সম্পাদক]

গণ আন্দোলনকে দ্বিতীয় যে ঝুঁকির মোকাবিলা করতে হচ্ছে সেটি হলো প্রতিরোধ সংগ্রাম-এর এনজিও-করণ। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা বিকৃত করা সহজ হবে - বলা হতে পারে যে আমি সকল এনজিও-কে অভিযুক্ত করছি। কিন্তু সেটা হবে একটা মিথ্যা। বরাদ্দকৃত অর্থ পাচার অথবা কর ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত (বিহারের মতো রাজ্যে সে রকম অর্থ যৌতুক হিসেবে দেয়া হয়) ভূয়া এনজিও-র মধ্যে অবশ্যই কিছু এনজিও মূল্যবান কাজ করছে। তবে, এখানে গুটিকয় এনজিও বিশেষের ইতিবাচক কাজ থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এনজিও সংক্রান্ত বিষয়কে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ ভারতে বিদেশ থেকে ফান্ড পাওয়া এনজিও-র বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে ১৯৮০ দশকের শেষের দিকে ও ১৯৯০ দশকে। এটা ঘটে সে সময় যখন ভারতীয় বাজারকে নব্য-উদারনীতিবাদের (neoliberalism) কাছে খুলে দেয়া হচ্ছিল। সেই সময়ে অবকাঠামোগত সংস্কারের চাহিদা অনুসারে ভারত সরকার গ্রাম উন্নয়ন, কৃষি, বিদ্যুত ও শক্তি, পরিবহন ও জনস্বাস্থ্য থেকে ভর্তুকি তুলে নিচ্ছিল। কাজেই সরকার তার ঐতিহ্যগত ভূমিকা ত্যাগ করলে এনজিওগুলো সে সব খাতে কাজ করার জন্য ঢুকে পড়ে। তবে পার্থক্য হলো, এনজিওগুলোর লভ্য অর্থের পরিমাণ তুলে নেয়া প্রকৃত গণ ভর্তুকির অর্থের তুলনায় একটি নগণ্য ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অধিকাংশ বৃহৎ সু-অর্থায়িত এনজিও উন্নয়ন ও সাহায্য সংস্থার কাছে থেকে অর্থ ও পরামর্শ পেয়ে থাকে। আবার এই উন্নয়ন ও সাহায্য সংস্থাগুলো অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে পশ্চিমা সরকারসমূহ, বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ ও কিছু বহুজাতিক কর্পোরেশনের কাছ থেকে। এই এনজিওগুলো একই সংস্থাভুক্ত না হলেও তারা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত একই ঢিলেঢালা রাজনৈতিক কাঠামোর, যে কাঠামো নব্য-উদারনীতি পরিকল্পনার দেখভাল করে ও প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী ভর্তুকি কমানোর দাবি জানায়।

কেন এসব সংস্থাগুলো এনজিও-দেরকে অর্থায়ন করে থাকে? এটা কি কেবল সেই পুরোনো মিশনারী মনোবৃত্তি? অপরাধবোধ? এটা আসলে সে রকম কিছু নয়।

এনজিওগুলো এই ধারণা দেবার চেষ্টা করে যে, তারা একটি পশ্চাদপসরণরত সরকার কর্তৃক সৃষ্ট শুন্যতাকে পূরণ করছে। হ্যাঁ তারা তা করছে, তবে সেটা বস্তুগতভাবে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। এনজিওগুলোর আসল ভূমিকা হলো রাজনৈতিক ক্রোধকে প্রশমিত করে দেয়া এবং জনগণের যা অধিকার হিসেবে প্রাপ্য তা সাহায্য বা উপকার হিসেবে বিতরণ করা। তারা জনগণের চিন্তাজগৎকে পরিবর্তন করে দেয়। তারা জনগণকে পরনির্ভরশীল বানায় ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভোঁতা করে দেয়। এনজিওগুলো সরকার ও জনগণের মধ্যে এবং সাম্রাজ্য ও অধীনস্থদের মধ্যে এক ধরনের বাফার (Buffer) হিসেবে কাজ করে। তারা আলোচনায় সালিশ নিষ্পত্তিকারী, ব্যাখ্যাদাতা ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তারা অন্যায় ও অযৌক্তিক যুদ্ধে "গ্রহণযোগ্য লোকটির" ভূমিকা পালন করে থাকে।

চূড়ান্ত বিচারে, এনজিওগুলো তাদের অর্থ দাতাদের কাছেই দায়বদ্ধ, যে জনগণের মধ্যে তারা কাজকরে তাদের কাছে নয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা যাকে সূচক প্রজাতি (indicator species) বলে থাকেন এনজিওগুলো হলো তাই। এটা যেন এ রকমই যে, নব্য-উদারনীতি দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ যতবেশী ব্যাপক, এনজিওগুলোর প্রাদুর্ভাবও তত বেশী হয়ে থাকে। এর সত্যতা সবচাইতে তীক্ষ্ণভাবে ধরা পড়ে এতে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন কোন একটি দেশ দখলের প্রস্তুতি নেয়, তখন সে একই সময়ে এনজিওগুলোকে প্রস্তুত করে রাখে যাতে তারা ঐ দেশটাতে গিয়ে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের জঞ্জাল সাফ করার কাজ করতে পারে।

যাতে তাদের আর্থিক উৎস যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং যে দেশে তারা কাজ করে সে দেশের সরকার যাতে তাদের কাজের অনুমতি দেয় সেটা নিশ্চিত করার জন্য এনজিওগুলোকে তাদের কাজকে কমবেশী রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বর্জিত একটি ঢিলেঢালা কাঠামোর মধ্যে উপস্থিপন করতে হয়। সেটা হতে পারে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত যে কোন দেশে। তবে যেই হোক না কেন, সেটা হবে অবশ্যই একটি *অসুবিধাজনক* ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত। "এনজিও প্রেক্ষিত" যে দ্রুত মর্যাদা পাচ্ছে সেটা অকারণে নয়।

গরীব দেশ ও যুদ্ধাঞ্চল থেকে পাঠানো তাদের অরাজনৈতিক ও (এবং সেজন্য আসলে চরম রাজনৈতিক) সংকট-সম্পর্কিত রিপোর্টগুলো (distress reports) প্রকৃত অর্থে সে সব (কৃষ্ণ) দেশের (কৃষ্ণ) জনগণকে মনস্তাত্বিক শিকার বানিয়ে ফেলে। *আর একজন অপুষ্টিতে ভোগা ভারতীয়, আর একজন ক্ষুধার্ত ইথিওপিয়ান, আর একটি আফগান শরণার্থী শিবির, আর একজন পঙ্গু সুদানীর .....* জন্য সাদা মানুষের সাহায্য দরকার। তারা ধূর্ততার সাথে গতানুগতিক বর্ণবাদী ধারণাকে জোরদার করে এবং পশ্চিমা সভ্যতার সাফল্য, আরাম আয়েশ ও করুণাকে (কঠিন প্রেম) পুনর্ব্যক্ত করে। তবে গণহত্যা, উপনিবেশবাদ ও দাস প্রথার ইতিহাসের অপরাধবোধকে বাদ দিয়ে। এনজিওগুলো হলো আধুনিক যুগে ধর্মনিরপেক্ষ মিশনারী।

এনজিওগুলোর অর্থকড়ি বিকল্প রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে যে ভূমিকা - কম মাত্রায় তবে অধিক ক্ষতিকরভাবে - পালন করে থাকে তা হলো ফটকা পুঁজির মতো, যা একটা গরীব দেশের অর্থনীতিতে আসা যাওয়ার করে থাকে। কি হবে না হবে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিতে শুরু করে।

এনজিওগুলোর পুঁজি সম্মুখ সংগ্রামকে আলোচনার দিকে নিয়ে যায়। প্রতিরোধকে রাজনীতিবিযুক্ত করে। তারা স্থানীয় জনগণের আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করে, যে আন্দোলন ঐতিহ্যগতভাবে ছিল আত্মনির্ভরশীল। এর্নজিওগুলোর টাকা থাকে সে সব স্থানীয় লোকজনকে চাকুরী দেয়ার, যারা অন্যথায় প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মি হতে পারতো, কিন্তু চাকুরি পেয়ে তারা ভাবে যে তারা তাৎক্ষণিক, সৃষ্টিশীল কিছু একটা করছে (এবং এটা করে তারা আয় উপার্জনও করছে)। দান (charity) দাতা ও গ্রহীতা উভয়কে তাৎক্ষণিক আত্মসুখ দেয়। তবে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে ভয়াবহ। প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিরোধ সংগ্রাম সে রকম সহজ সরল পথ দেখায় না।

রাজনীতির এনজিও-করণ প্রতিরোধ সংগ্রামকে ভদ্র, গ্রহণযোগ্য, বেতনধারীদের সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সময় ধরে চলা আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ একটি চাকুরীতে রূপান্তরিত করতে চায়।

সত্যিকার প্রতিরোধ সংগ্রামে আছে সত্যিকার ফল। এখানে কোন বেতন নেই।

অরুন্ধতী রায় হলেন দি গড অব স্মল টিঙ্গস উপন্যাসের লেখিকা। এই উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৯৭ সালে বুকার পুরষ্কার লাভ করেন। তিনি চারটি প্রবন্ধ সংকলনও প্রকাশ করেছেন। এগুলো হলো An Ordinary Person's Guide to Empire, War Talk, Power Politics, এবং The Cost of Living. ডেভিড বারসামিয়ান সম্পাদিত বই The Checkbook and the Cruise Missile: Interview with Arundhati Roy এর বিষয়বস্তু হলেন তিনি। অরুন্ধতি রায় ২০০২ সালে Lannan Foundation থেকে Lannan Award for Cultural Freedom লাভ করেন। একজন স্থপতি হিসেবে প্রশিক্ষিত অরুন্ধতী রায় ভারতের দিল্লীতে বসবাস করেন।

পার্টি দলিল

ইউপিডিএফ ও অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সমন্বয় সভায় প্রদত্ত রিপোর্ট এর অংশ বিশেষ

গত ১৬-১৮ অক্টোবর ২০০৪ ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ), পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের মধ্যে ৬ষ্ঠ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার ১ম দিনের প্রথম অধিবেশনে ইউপিডিএফ-এর আহ্বায়ক প্রসিত বিকাশ খীসা এক রিপোর্ট পেশ করেন। স্বাধিকার পাঠকদের জন্য নিম্নে রিপোর্টের চুম্বক অংশগুলো প্রকাশ করা হলো:

দেশীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে: ১০ অক্টোবর বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার তিন বছর পূর্ণ করে ৪ বছরে পদার্পন করেছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন চার দলীয় জোট সরকারের ব্যর্থতা পর্বত প্রমাণ। দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি। প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও হত্যা, খুন, গুম, সন্ত্রাস হচ্ছে। সন্ত্রাস দমনের নামে সরকার র‍্যাব বাহিনী গঠন করলেও, এ বাহিনী পরিচালিত হচ্ছে দলীয় রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের লক্ষ্যে। র‍্যাব এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ৩০ এপ্রিল সরকার পতনের ডেটলাইন ঘোষণা করলেও কার্যত: বড় রকমের তেমন কিছু করতে সক্ষম হয়নি। ২১ আগষ্ট বোমা হামলার প্রতিবাদে সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ আওয়ামী লীগের হাতে এসে যায়, আওয়ামী লীগ সেটা সেভাবে কাজে লাগাতে পারেনি।

এ পর্যন্ত সভা সমাবেশে বোমা হামলার রহস্য উদ্‌ঘাটিত না হলেও, ২১ শে আগষ্টের বোমা হামলার পর জট খুলতে শুরু করেছে। বোমা হামলার সাথে সন্দেহের তালিকায় এই প্রথম বার সেনাবাহিনীর নাম প্রকাশ্যে এসেছে। বোমা হামলার সাথে সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান মুস্তাফিজুর রহমান।

দেশের সংকট কতখানি গভীর তা এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নৈরাজ্যময় ও সংকটপূর্ণ। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের হাতে রয়েছে আরো দু বছর। দেশের রাজনীতিতে এটা দেখা যায় যে, শেষের দুটি বছর বিরোধী দল রাজনীতির মাঠ গরম করে রাখে। কোন না কোন ইস্যুতে হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে বিরোধী দল সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। এ সমস্ত তৎপরতার মাধ্যমে বিরোধী দল চেষ্টা করে সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরে নিজেদের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে।

নির্বাচন সংক্রান্ত: নির্বাচন ঘনিয়ে এলেই দেশে এক ধরনের হুজুগ ও উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামেও এ ব্যারাম সংক্রমিত হয়েছে। পাহাড়িদের মধ্যেও কিছু লোক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিএনপি ছাড়া অন্য কিছু দেখে না, বুঝতে চায় না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ প্রথম বারের মতো আওয়ামী লীগকে গণহারে ভোট দেয় '৯১ সালে। তারপর ৯৬ সালে। তার আগে কখনই আওয়ামী লীগের প্রার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন আসন থেকে জিততে পারেনি। ৭০ সালের নির্বাচনে যে সময়টা ছিলো আওয়ামী লীগের জয় জয়কার অবস্থা। সে সময়েও কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। ৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রথম বারের মতো পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে একটি আসন বরাদ্দ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ছিলো দুটো আসন। এই সত্তরের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী রাঙামাটির চারু বিকাশ চাকমাকে বিপুল ভোটে হারিয়ে বিজয়ী হন। প্রাদেশিক পরিষদের আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আওয়ামী লীগের প্রার্থী কে. কে. রায়কে হারিয়ে বিজয়ী হন। দক্ষিণাঞ্চলের আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অং শৈ প্রু চৌধুরী বিজয়ী হন।

বাংলাদেশ আমলে ৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২টি আসন (বরাদ্দ ছিল)। উত্তরাঞ্চলের আসনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, দক্ষিণাঞ্চলের আসন থেকে সাথোয়াই রোয়াজা জনসংহতি সমিতির ব্যানারে জয়লাভ করেন। ... ৭৯ সালে জিয়াউর রহমানের সময়ে উত্তরাঞ্চলের আসন থেকে জাসদ প্রার্থী উপেন্দ্র লাল চাকমা এবং দক্ষিণাঞ্চলে স্বতন্ত্র প্রার্থী অং শৈ প্রু চৌধুরী জয়লাভ করেন। এরশাদের আমলে ৮৬ ও ৮৮ সালে দু বার নির্বাচন হয়। দুটি নির্বাচনই ছিল বিতর্কিত। ৮৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য তিনটি আসন বরাদ্দ করা হয়। তিনটি আসনেই জাতীয় পার্টির প্রার্থী জয়লাভ করে। ঐ নির্বাচন দেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সে সময় পর পর দুবার একই প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছিলেন: খাগড়াছড়ি আসন থেকে রামগড়ের আলিমুল্লাহ, রাঙ্গামাটির আসন থেকে বিনয় কুমার দেওয়ান, আর বান্দরবানের আসন থেকে মং শৈ প্রু চৌধুরী বিজয়ী হয়েছিলেন।

যে দলসমূহের পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী নেই, সেটি জেনেও তাদের পেছনে বিরাট প্রত্যাশা করে দৌড়ানো চরম অপরিণামদর্শীতা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেদের মতামত প্রকাশ করার ম্যান্ডেট পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি বা জামাতে ইসলামীর হাতে তুলে দিতে পারে না।

সেনাবাহিনী: সেনাবাহিনী সেটলারদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। সেটলারদের খাতে বরাদ্দকৃত রেশন ও বাজেট থেকে একটা অংশ গায়েব করে দেয় সেনা কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র। তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে সেটলারদের কিছু সর্দার।

শরণার্থী সংক্রান্ত: বহুল আলোচিত প্রত্যাগত শরণার্থীদের দাবি পূরণের ইস্যুটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও বর্তমানে জনসংহতি সমিতির কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের পকেটে রুমালের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। জনসংহতি সমিতি তাদের প্রয়োজনের সময়ে তা বের করে, প্রয়োজন শেষ হলে ঢুকিয়ে রাখে। ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে থাকার সময়ও জনসংহতি সমিতি শরণার্থী ইস্যুকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। দেশে ফিরেও একইভাবে নিজেদের সংকট উত্তরণের জন্য শরণার্থী ইস্যুটি কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু শরণার্থীদের ন্যায্য দাবি পূরণের লক্ষ্যে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক কোন কর্মসূচী জনসংহতি সমিতি দেয়নি। তাদের থেকে সে ধরনের কর্মসূচী দেবার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। সর্বসাম্প্রতিক গেল ৮-৯ অক্টোবর যে সড়ক অবরোধ ঘোষণা দেয়, তা সম্পূর্ণ মতলববাজী ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যাগত শরণার্থীদের ইস্যুটি নিয়ে সংকীর্ণ দলীয় ও গোষ্ঠি স্বার্থ হাসিলের এ ধরনের নিষ্ঠুর খেলা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য। ইউপিডিএফ এ ধরনের ষড়যন্ত্রের খেলা বন্ধ করার আহ্বান জানায়। ... আজ এ কথাটি সত্যের খাতিরে উচ্চারণ করা দরকার যে, জনসংহতি সমিতির ভাগ্যের সাথে প্রত্যাগত শরণার্থীদের ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত নয়। .. কেবল জনসংহতি সমিতি একা এককভাবে আন্দোলন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, শরণার্থী ইস্যুটিও যদি জনসংহতি সমিতি তাদের দলীয় ইস্যু বানিয়ে আন্দোলন করে তাহলে শরণার্থীদের সামগ্রিক কোন লাভ হবে না। শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তন ৬ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি এই বাস্তব জাজ্বল্য সত্যটি কেউ না বুঝে, তারা হয় নিরেট বোকা, কোন কিছু বুঝতে পারে না, নয়তো চরম সুবিধাবাদী। .. এখন উচিত হবে শরণার্থী ইস্যুকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ইস্যুতে পরিণত করা।

জনসংহতি সমিতির কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই শরণার্থী ইস্যুটি নিজেদের পকেটে রাখার মতলবে কিছু লোককে দিয়ে কমিটি করেছে। তাদের দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচীর ডাক দিচ্ছে।

আভ্যন্তরীন শরণার্থী: ভারতে আশ্রিত শরণার্থীদের ব্যাপারে প্যাকেজ চুক্তি হলেও, আভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের ব্যাপারে সে জাতীয় বিশেষ আলাদা কোন চুক্তি হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই আভ্যন্তরীণ শরণার্থীরা উপেক্ষিত থেকে গেছে।

প্রত্যাগত শরণার্থীদের বিষয়টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার এবং গুরুত্ব পাওয়ায় সরকারকে মুখ রক্ষার্থে হলেও অন্তত: কিছু দাবি পূরণ করতে হয়েছে।

বিবিধ

গঙ্গারামে এ কোন রাম?

গত ২৬ সেপ্টেম্বর আনুমানিক সকাল ৯টায় গঙ্গারাম লক্ষীছড়ি সাব-জোনের মেজর সোহরাব (২০ বেঙ্গল) এর নেতৃত্বে ২০-২৫ জনের একটি সেনাদল মোবাছড়ি যায়।

সেখানে সেনা সদস্যরা যতিন চাকমা পিতা প্রতি কুমার চাকমা ওরফে আলসে-কে মারধর করে ও সুর কুমার চাকমার বাড়িতে তল্লাশি চালায়। মেজর সোহরাব গ্রামবাসীদের বলেন, তাদেরেকে ঠিকমত লাকড়ি দেয়া হয় না বলেই যতিন চাকমার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। এছাড়া সেনারা রণজিৎ চাকমা - পিতা ধারাশ্যা চাকমা - এর কাছ থেকে সেগুন কাঠের রদ্দা ৩৭ মাথা, সুরকুমার চাকমা - পিতা মৃত ফেলাকাজি চাকমা - এর কাছ থেকে সেগুন গোল ২৭ মাথা ও বাহাদুয্যা চাকমা পিতা ভুত্যা চাকমার কাছ থেকে বেশ কিছু ঝুলি বাঁশ জোর করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

প্রতি সপ্তাহে মেজর সোহরাব গঙ্গারামের বাঁশ ব্যবসায়ীদের প্রতি চালি বাঁশ থেকে ১ পাতা করে বাঁশ জোর করে নিয়ে যায়। প্রতি চালি থেকে ঠিকমত বাঁশ দেয়া না হলে ব্যবসায়ীদেরকে হুমকি সহ শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শুধু মেজর সোবরাব নয়, অন্যান্য সেনা কমান্ডারদের বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ৪ আগষ্ট সকাল বেলা গঙ্গারাম লক্ষীছড়ি সাবজোনের বিএসএম মোখলেস এর নেতৃত্বে ১২-১৫ জনের একটি সেনা দল মোবাছড়ি যায়। উক্ত সেনা কমান্ডার সুরকুমার চাকমা পিতা মৃত ফেলাকাজি এর কাছ থেকে (যার সম্পর্কে উপরে বলা হয়েছে) সেগুন গোল ১৮৪ মাথা জোর করে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গাছগুলো লক্ষীছড়ি মুখ ঘাটে বেঁধে রাখে। পরে স্থানীয় মুরুব্বীদের চাপে সে অর্ধেক গাছ নিয়ে যাওয়ার জন্য গাছের মালিককে অনুমতি দেয়। তবে বাকি গাছগুলোর জন্য উক্ত সেনা কমান্ডার গাছের মালিকের সাথে দেনদরবার করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তার কাছ থেকে পকেট খরচের টাকা দাবি করে। গাছের মালিক সুরকুমার উক্ত কমান্ডারকে "পকেট খরচ" ১,৫০০ টাকা দিলে সে গাছগুলো ছেড়ে দেয়। এই পকেট খরচের খবরটা যাতে "স্যারের" কানে না যায় সে জন্য মোখলেস সাহেব সুরকুমারকে কড়াভাবে জানিয়ে দেয়।

সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সেনা কমান্ডারের বিরুদ্ধে এ ধরনের আরো বহু দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

জেএসএস সদস্যদের কান্ড কারখানা!

গত ৭ সেপ্টেম্বর নান্যাচর বাজারে দিন দুপুরে মাতাল অবস্থায় জেএসএস সদস্য অমর সিং চাকমা ও সিদ্ধার্থ চাকমার মধ্যে মারামারি হয়। তাদের মধ্যে স্বার্থগত বিরোধ, কর্তৃত্ব খাটানো ও নানান কেলেঙ্কারি নিয়ে হাতাহাতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

মাতাল অবস্থায় উল্লিখিত ব্যাপারে সিদ্ধার্থ চাকমা ফয়সালা করতে চাইলে অমর সিং চাকমা ক্ষিপ্ত হয়ে সিদ্ধার্থ চাকমার উপর চালায়। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি হয়।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর জেএসএস সদস্য সেনাবাহিনীর দালাল সিদ্ধার্থ চাকমাকে নান্যাচর বাজারের লোকজন গণ ধোলাই দিয়েছে। পরে সেনা বাহিনীর চাপাচাপিতে মুচলেকা আদায় করে জনতা তাকে ছেড়ে দেয়। সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ না করলে নান্যাচরের লোকজন সিদ্ধার্থ চাকমাকে গণধোলাই দিয়ে মেরে ফেলতো বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সেদিন সিদ্ধার্থ চাকমা মাতাল অবস্থায় মিসেস চিরদেবী চাকমার সাথে অশোভন আচরণ করতে থাকে এবং তার জন্য মদ কিনে আনতে বলে। অতিষ্ঠ চিরদেবী চাকমা অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা সিদ্ধার্থ (ভালো কাজে তো মহামতি গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধার্থের মতো নাছোড়বান্দা হতে পারে না!) তাকে মদ আনতে বাধ্য করতে চাইলে ও চিরদেবীর সাথে অশোভন আচরণ করলে লোকজন এর প্রতিবাদ করেন। অপরদিকে সিদ্ধার্থ চাকমা প্রতিবাদকারী লোকজনকে জেএসএস ও সেনাবাহিনীর ভয় দেখায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে জনতা তাকে গণধোলাই দিতে থাকে। এক পর্যায়ে সেনা বাহিনী ঘটনার খবর পেয়ে সিদ্ধার্থ চাকমাকে গণরোষ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। বিভিন্ন শর্তে মুচলেকা দিয়ে সেনাবাহিনী সিদ্ধার্থকে মুক্ত করে।

সিদ্ধার্থ চাকমা দাজ্যা ভূবন্যার মতো একজন দালাল। সে একই সাথে সেনাবাহিনীর দালাল ও সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য। দীর্ঘদিন ধরে তার অত্যাচারে নান্যাচরের লোকজন অতিষ্ঠ।

বাঘাইছড়ির আজাছড়াগ্রামে ব্যাপক সেনা তল্লাশি

আজাছড়া মজঝিদ ক্যাম্পের কমান্ডার সিরাজ বি.এস.এম. সাখাওয়াত ও লে.জি.এম মুসফিকুর রহমানের নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একটি সেনা দল ২১শে আগষ্ট বিকেল আনুমানিক ২টার সময় আজাছড়া গ্রামে হানা দেয়। সৈন্যরা কে.পি.এম (কর্ণফুলি পেপার মিল) এর চুরি হয়ে যাওয়া লোহার রদ খোঁজার নামে উক্ত গ্রামে বেশ কয়েকটি বাড়ি ঘরে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। যাদের ঘরে তল্লাশি চালানো হয়েছে তাদের নাম হলো:

১. চন্দ্রহাস কার্বারী পিতা রহিমনি, ২. বিজয় মনি চাকমা পিতা মজাগালা চাকমা, ৩. চন্দ্র সেন চাকমা পিতা রহিমনি চাকমা, ৪. জয় বাঁশি চাকমা পিতা ইন্দ্র নাথ চাকমা, ৫. অমলেন্দু চাকমা পিতা সম্ভু চাকমা ৬. স্মৃতি বিন্দু চাকমা পিতা শম্ভু চাকমা।

এছাড়া সেনা সদস্যরা চন্দ্রহাস কার্বারীর বাড়িতে বেড়াতে আসা বাঘাইহাটের চাউল ব্যাবসায়ী মোঃ ঝুলন চৌধুরীকে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরে চন্দ্রহাস কার্বারীকে জামিন রেখে তাকে ছেড়ে দেয়। তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

মোঃ ঝুলন চৌধুরী পুরোনো বন্ধু হিসেবে আজাছড়ায় কার্বারীর বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন।

ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহের

শেষ পাতার পর

ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন পার্থক্য নেই। কেবল সরকার সমীরণ দেওয়ানদের বদলে সন্তু লারমাদেরকে আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে বসিয়ে তাদেরকে দিয়ে জনগণের আন্দোলনকে স্তব্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেজন্য সরকার বিরোধী আন্দোলনের হাঁক ডাক সত্ত্বেও আঞ্চলিক পরিষদের খুঁটিতে বাঁধা থাকায় সন্তু লারমাদের পক্ষে কোন ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের সম্পর্কে বলা হয়, জেএসএস নেতৃবৃন্দ তাদেরকে বরাবরই নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করে আসছেন। তাদেরকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করছেন।

জুম্ম শরণার্থী নেতা নতুন কুমার চাকমা

১ম পাতার পর

প্রশ্নে জেএসএস এর ভুল পরিলক্ষিত হয়।"

তিনি আরো বলেন, "জেএসএস নেতৃবৃন্দ শরণার্থীদেরকে নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। আমি মনে করি, বর্তমান সময়ে নতুন দিনের পার্টি ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের নীতি আদর্শ ও কৌশলই সঠিক। জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন ও অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে এই পার্টিই সত্যিকারভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। সে কারণে আমি এই পার্টিতে যোগদান করছি। সেই সাথে আমি সকল শরণার্থী নেতা ও কর্মিসহ সকল স্তরের জনগণকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামকে বেগবান করতে এগিয়ে আসুন।"

নতুন কুমার চাকমা ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। তিনি ১৯৯৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইউপিডিএফ এর পার্টি প্রস্তুতি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। পার্টিতে যোগদানের আগে ইউপিডিএফ এর সক্রিয় সদস্য না হলেও তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পার্টিকে সহযোগিতা দিয়েছেন।

এলাকা সংবাদ

জেএসএস কর্তৃক নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণের চেষ্টা

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ গত ৪ আগষ্ট ২০০৪ সিদ্ধার্থ চাকমা ও অমর সিং চাকমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির সদস্যরা সুপায়ন চাকমা, ১৫, (পিতা বিন্দু কুমার চাকমা) নামে একজনকে নান্যাচর বাজার থেকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু তার পাড়ার সঙ্গীদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সুপায়ন চাকমাকে অপহরণের কারণ হলো সে পিসিপি নান্যাচর শাখার সক্রিয় সদস্য আলোড়ন চাকমার ছোট ভাই। তাকে অপহরণের মাধ্যমে আলোড়ন চাকমা ও তার পরিবারের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করাই ছিলো জেএসএস সদস্যদের লক্ষ্য। সুপায়ন চাকমাদের বাড়ি নান্যাচরের উত্তর ফিরিঙ্গি পাড়ায়।

তাকে অপহরণে ব্যর্থ হওয়ার পর জেএসএস সদস্যরা তাকে বিভিন্ন হুমকি দেয়।

এছাড়া, একই তারিখ সকাল ১১টার সময় পিসিপি ও ইউপিডিএফ এর সদস্যরা নান্যাচর বাজার থেকে সাংগঠনিক কাজ শেষে ফেরার পথে জেএসএস সদস্যরা তাদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা চালায়। সেনা পুলিশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তারা এই আক্রমণের চেষ্টা চালালেও, প্রতিরোধের সম্ভাবনা দেখে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া ও আদর্শিকভাবে বিচ্যুত জেএসএস প্রায়শঃ টেরর টেকটিকস হিসেবে ইউপিডিএফ এর সমর্থক ও আত্মীয় স্বজনদের অপহরণ, খুন ও মুক্তিপণ আদায় করে থাকে।

জেএসএস কর্তৃক দুই নিরীহ ব্যক্তি অপহৃত, মুক্তিপণ আদায়

গত ৩রা আগষ্ট ২০০৪ জ্ঞান রঞ্জন চাকমা ওরফে নলেন এর নেতৃত্বে জেএসএস সদস্যরা নন্দিলাল চাকমা ও রিপেন চাকমা নামে দু ব্যক্তিকে রাঙ্গামাটি শহর থকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

অপহরণকারীরা তাদেরকে অস্ত্রের মুখে টেম্পিতে তুলে প্রথমে তবলছড়ি বাজার ও পরে সেখান থেকে বড়াদমে নিয়ে যায়। পরে ৪০ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে ৭ আগষ্ট ছেড়ে দেয়।

নন্দিলাল চাকমার বাড়ি নান্যাচর উপজেলার শণখোলা পাড়ায় ও রিপন চাকমার বাড়ি একই উপজেলার যাদুগো ছড়া গ্রামে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তারা সেদিন রাঙ্গামাটি গিয়েছিলেন।

নান্যাচরে সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ গ্রামবাসী গ্রেফতার ও শারীরিক নির্যাতন

গত ১৩ আগষ্ট ২০০৪ নান্যাচর সেনা জোন থেকে ১০/১২ জনের একটি সেনাদল কাট্টলতুলি গ্রামে হানা দেয়। সেনাদলটির নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন শহীদুল ইসলাম।

সেনারা ঐ গ্রামে বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালায় ও লোকজনকে অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে ফেরার সময় সেনারা ৬৩ নং কাট্টলতুলি মৌজার হেডম্যান নির্মলেন্দু বিকাশ খীসা, ৫৯, সহ পাঁচ ব্যক্তিকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে আসে। গ্রেফতারকৃত অন্যান্যরা হলেন মিত্র চাকমা, ৩৫, পিতা নিকুঞ্জ বিহারী চাকমা; সুধীর কুমার চাকমা, ৫২, পিতা অনিল চন্দ্র চাকমা; শান্তিপ্রিয় চাকমা, ৩২, পিতা গঙ্গাধর চাকমা ও তরঙ্গ চাকমা, ৩৫, পিতা অজ্ঞাত।

সেনারা তাদের ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালানোর পর ছেড়ে দেয়।

নান্যাচরে এক নিরীহ ব্যক্তি মিথ্যা মামলার শিকার

গত ২৬ আগষ্ট ২০০৪ বুড়িঘাট সেনাক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেন শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি সেনাদল উপজেলার গোলাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা রিপেন চাকমাকে (পিতা শুভাকিষ্ট চাকমা) এ্যাদমরা নামক স্থান থেকে আটক করে।

এ সময় সে পেসেঞ্জার বোট দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেনারা বোট থামিয়ে তার শরীর তল্লাশী করে ও বিভিন্ন প্রশ্ন করে তাকে হয়রানি করে।

তল্লাশীর পর তার কাছ থেকে কোন কিছু না পেলেও সেনারা তাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায় ও তার কাছ থেকে দুটি কার্তুজ পেয়েছে এই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করে। তাকে রাঙ্গামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

রিপেন চাকমা একজন নিরীহ গ্রামবাসী। রাজনীতি বা আন্দোলন সংগ্রামের সাথে সে মোটেই সংশ্লিষ্ট নয়।

এলাকাবাসীর ধারণা উক্ত সেনা কমান্ডারটি নিজের প্রমোশন পেতে যাতে সুবিধা হয় সে জন্য "সন্ত্রাসী: ধরার "সাফল্য" দেখানোর জন্য সে নিরীহ লোকজনকে এভাবে বলির পাঁঠা বানাচ্ছে। অতীতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

চট্টগ্রামে দুই নাম্বারী কর্তৃক বিনয় চাকমাকে অপহরণের ব্যর্থচেষ্টা

গত ৩১ জুলাই ২০০৪ রোজ শনিবার সন্ধ্যের দিকে জনসংহতি সমিতির লেলিয়ে দেয়া কতিপয় সন্ত্রাসী বিনয় চাকমাকে (পিতা অসীম চাকমা গ্রাম রাঙ্গাপানি ছড়া, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি) চট্টগ্রামের দেওয়ান হাটস্থ ঈদ্‌গাহ মোড় থেকে অপহরণ করে বান্ডেল রোডে অবস্থিত পাহাড়ি হোস্টেলে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত মারধর করলে সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

এরপর অজ্ঞান অবস্থায় তাকে সিএনজি ভাড়া করে অজানা স্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি রোডের অক্সিজেন মোড়ে পৌঁছলে তার জ্ঞান ফিরে আসে এবং সে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকে।

এ সময় সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ ট্যাক্সি থামিয়ে ড্রাইভারসহ দুইটি ট্যাক্সির ৭জন জেএসএস সদস্যকে আটক করে। এরা হলো ১. তপন চাকমা পিতা কৃষ্ণ চাকমা গ্রাম সার্বোতলী, বাঘাইছড়ি থানা, রাঙ্গামাটি; ২. সমন্ত চাকমা পিতা বুদ্ধ মোহন চাকমা গ্রাম সুবলং, থানা জুরাছড়ি, জেলা রাঙ্গামাটি; ৩. প্রজ্ঞা জ্যোতি চাকমা পিতা দেব বিকাশ চাকমা, রাঙ্গামাটি; ৪. অলক মিত্র চাকমা পিতা অঙ্গ লাল চাকমা গ্রাম তারাবনিয়া, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি; ৫. সঞ্চয় কান্তি চাকমা পিতা কালাচান চাকমা গ্রাম শিলছড়ি, থানা বরকল, রাঙ্গামাটি; ৬. অলক বিকাশ চাকমা পিতা প্রতুল চন্দ্র চাকমা গ্রাম সাতঘরিয়া পাড়া, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি ও ৭. বাবুল মারমা পিতা অজ্ঞাত।

এ ব্যাপারে ডবল মুরিং থানায় অপহরণ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ৩০১৭ ২/১.. ০২/৮/০৪। মূলত বিনয় চাকমাকে খুন করার উদ্দেশ্যে জেএসএস সদস্যরা তাকে রাঙ্গামাটির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

কেন তপন চাকমা তার দল বল নিয়ে বিনয় চাকমাকে অপহরণ করে তা বুঝতে হলে একটু পিছনের দিকে যেতে হবে।

বিনয় চাকমার মামাতো বোন অমর সোনা চাকমার সাথে বাঘাইছড়ির ভাঙ্গামুরা গ্রামের নলিনী রঞ্জন চাকমার ছেলে রোহিনী চন্দ্র চাকমার বিবাহ সম্পন্ন হয় চট্টগ্রামের ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গত ২৫ জুলাই ২০০৪। সাধারণভাবে দুই নাম্বারী সদস্য বলে পরিচিত ও এই অপহরণ মামলার আসামী তপন চাকমা বিবাহের আগে থেকে অমর সোনা চাকমাকে উত্যক্ত করতো।

বিবাহের পরও তপন চাকমা অমর সোনা চাকমাকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ও ফুসলিয়ে রোহিনী চন্দ্র চাকমার কাছ থেকে বাগিয়ে নেয়ার জন্য প্রায় সময় চেষ্টা করতো। এক পর্যায়ে তপন চাকমা তার দলবলসহ অমর সোনা চাকমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পাশের রুমে থাকা বিনয় চাকমা তার প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদ হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়।

ঘটনাটা ঘটে ৩০ জুলাই। এ সময়ও তার সহযোগী হিসেবে উপরোল্লিখিত অপহরণকারীরা সবাই ছিল। সেদিন বিনয় চাকমার সাথে আরো কয়েকজন সঙ্গি ছিল বিধায় তপন চাকমাদের অপহরণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর প্রতিশোধ হিসেবেই তার পরদিন অর্থাৎ ৩১ জুলাই তপন চাকমা তার সঙ্গীদের নিয়ে বিনয় চাকমাকে অপহরণ করে। এ সময় বিনয় চাকমা কাজ শেষে ফ্যাক্টরি থেকে ডবল মুরিং এ বাসায় ফিরছিল। এখানে সে ও অমর সোনা চাকমা ভাড়া বাসায় থাকে।

কাউখালিতে ইউপিডিএফ কর্মি আটক

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪সেনা সদস্যরা রাঙ্গামাটির কাউখালিতে ১২ জন ইউপিডিএফ সদস্যসহ ১৬ জনকে আটক করে। পরে চার জন গ্রামবাসীকে ছেড়ে দিয়ে বাকি ইউপিডিএফ সদস্যদেরকে সেনারা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গ্রেফতারকৃত ইউপিডিএফ সদস্যদের কারো বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা কিংবা কোন আদালতে মামলা ছিল না। গ্রেফতারেরও কোন কারণ দেয়া হয়নি। গ্রেফতারের সময়ও তাদের কাছ থেকে বেআইনী কোন কিছু পাওয়া যায়নি।

বর্তমানে আটককৃতদেরকে রাঙ্গামাটি জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ১৯ক ধারায় মামলা দায়ের করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন ১. অন্তর চাকমা ওরফে পার্থ, বয়স ২৪, পিতা সুর কুমার চাকমা গ্রাম চেলাছড়া, কাউখালি; ২. জ্ঞান প্রিয় চাকমা, বয়স ৩৪, পিতা মৃত ভোলা চাকমা গ্রাম কুদুকছড়ি; ৩. ইংটন চাকমা, বয়স ২৫, পিতা বিজয় কুমার চাকমা গ্রাম বন্দুকভাঙা; ৪. দিপং চাকমা ওরফে দিমেশ, বয়স ৩০, পিতা বেদ কুমার চাকমা গ্রাম দেবাছড়ি, কাউখালি; ৫. যুদ্ধমণি তঞ্চঙ্গ্যা, বয়স ২৬, পিতা নোয়ারাম তঞ্চঙ্গ্যা গ্রাম তিনছড়া, চন্দ্রঘোনা; ৬. কালাধন চাকমা ওরফে প্লাবন, বয়স ২৮, পিতা চন্দ্র কুমার চাকমা গ্রাম শুকনাছড়ি, কাউখালি; ৭. চিং আসাই ক্রু মারমা, বয়স ১৯, পিতা উগ্যা ক্রু মারমা গ্রাম বড়ইছড়ি, কাউখালি; ৮. অনল বিকাশ তালুকদার, বয়স ৩০, পিতা বীর ভদ্র তালুকদার গ্রাম তালুকদার পাড়া, কাউখালি; ৯. চন্দ্র মোহন চাকমা, বয়স ৩০, পিতা বিজু মোহন চাকমা গ্রাম হাজাছড়ি, বটতলি পাড়া, নান্যাচর; ১০. বিমান চাকমা, বয়স ৫০, পিতা নোয়া চাকমা গ্রাম মিতিঙ্গ্যাছড়ি, কাউখালি; ১১. ধর্ম মোহন চাকমা, বয়স ২৫, পিতা ক্ষীণ ধন চাকমা গ্রাম বেঙ্গীছড়া, লংগদু; ১২. বিপিন চাকমা ওরফে রিপন, বয়স ১৮, পিতা রাঙ্গা চাকমা গ্রাম ভাইবোন ছড়া, লংগদু।

সশস্ত্র জেএসএস সদস্যদের হাতে এক ইউপিডিএফ সমর্থক খুন

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ জনংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যরা নান্যাচরের বগাছড়িতে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে। ১৬ অক্টোবর ২০০৪ রোজ সোমবার এ ঘটনা ঘটে।

জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা দুপুর ১২টার দিকে জুনু চাকমা ওরফে রেখনা বাপকে (বয়স ২৭) বগাছড়ি বাজার থেকে ধরে এনে তার পর গুলি করে মেরে ফেলে। ঘটনাস্থলের ১৫০ গজের মধ্যেই রয়েছে একটি পুলিশ ক্যাম্প। আগে এখানে সেনা বাহিনীর সদস্যরা থাকতো। তারা সেখান থেকে অন্যত্র সরে গেলে পুলিশ সেখানে অবস্থান নেয়।

জুনু চাকমা একজন একনিষ্ট ইউপিডিএফ সমর্থক। তার গ্রাম হলো তৈচাকমা দোজর পাড়া, ২ নং নান্যাচর ইউনিয়ন।

তিনি এর আগে সেনাবাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিন বিদেশী অপহৃত হলে সেনা সদস্যরা সন্দেহমূলকভাবে তাদের গ্রামের লোকজনকে গণহারে গ্রেফতার করে ক্যাম্পে নিয়ে যায় ও শারীরিকভাবে মারধর করে। জুনু চাকমা হলেন এদের একজন। সেনা সদস্যরা সে সময় তার ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছিল।

সরকারের কাছে আত্মসমর্পনের পর জনসংহতি সমিতি তার ভূমিকা পাল্টিয়ে জনগণের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে। গত ৬/৭ বছরে সমিতির সশস্ত্র সদস্যরা দুই শতাধিক ইউপিডিএফ কর্মি সমর্থক ও নিরীহ লোকজনকে খুন করেছে। অনেককে নিজ বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করেছে। সাধারণ লোকজনকে অপহরণ ও জিম্মি করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করেছে। জনগণ আজ তাদের অত্যাচারে চরমভাবে অতিষ্ঠ। সশস্ত্র হামলা বন্ধ করে আলোচনার টেবিলে আসার ইউপিডিএফ-এর বারংবার আহ্বান সত্ত্বেও তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু ইউপিডিএফ এর আহবান নয়, বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরুসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের ঐক্য ও সমঝোতার আহ্বানও তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি।

পানছড়ির ধুদুকছড়ায় কিশোরী ধর্ষিত

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ রোজ শনিবার পানছড়ির ধুদুকছড়ায় রূপসেন চাকমা পাড়ার বিডিআর ক্যাম্পের কোয়ার্টার মাস্টার এরশাদ হাবিলদার কর্তৃক ১৬ বছরের এক কিশোরী (সামাজিক কলঙ্কের কথা বিবেচনা করে তার নাম গোপন রাখা হলো) ধর্ষণের শিকার হয়। সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পাড়ার লোকজন গাছ কাটা শেষে ফেরার পথে উক্ত ঘটনার সম্মুখে পড়লে ঘটনাটি প্রকাশ পায়। বর্তমানে ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।

কাউখালির তালুকদার পাড়ায় নতুন সেনা ক্যাম্প চালু

সম্প্রতি রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালি সদর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে তালুকদার পাড়ায় একটি নতুন সেনা ক্যাম্প বসানো হয়েছে। গত জুলাই মাস থেকে এই ক্যাম্প চালু করা হয়েছে।

নতুন ক্যাম্প হওয়ার আগে সেখানে একটি পুলিশ ক্যাম্প ছিল। এখন সেটা সরিয়ে আনা হয়েছে। তালুকদার পাড়ায় পাশাপাশি পাহাড়ি ও বহিরাগত সেটলারদের বসবাস। ১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ২০০ পরিবার সেটলার পরিবারকে সেখানে নিয়ে এসে পাহাড়িদের জায়গা জমিতে জোরপূর্বক বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। পরে সেখান থেকে ২৫ পরিবারকে বান্দরবানের লামায় নিয়ে যাওয়া হয়।

রাজনৈতিক দূরভিসন্ধিমূলক এই সেটলারদের বসতিস্থাপনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সে সময় কাউখালির অন্যান্য জায়গায়ও বাঙালিদের নিয়ে আসা হয়। এর ফলে রাতারাতি জাতিগত দ্বন্দ্বসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৮০ সালের এই কাউখালিতেই প্রথম গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য পাহাড়িদের জায়গাজমি দখল করা।

কাউখালির লোকজনের ধারণা সেটলারদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্যই এই নতুন ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এর আগে ক্যাম্পটি ছিল তালুকদার পাড়া থেকে তিন মাইল দূরে পানছড়ি নামক গ্রামে। এলাকার জনগণ ক্যাম্প স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। ইদানিং বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় নতুন করে সেনা ক্যাম্প তৈরি করছে।

আর্মি ক্যাম্প ছাড়াও তালুকদার পাড়ায় ভিডিপি বা গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্যাম্প রয়েছে। সেটলারদের মধ্য থেকেই এই ভিডিপি গঠিত। পাহাড়িদের নিরাপত্তার জন্য এই ধরনের কোন কমিটি নেই। এটা যে বৈষম্যমূলক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশাল সেনা উপস্থিতি রাখার কারণ যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা নয়, বরং সেটলারদের ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র জাতীয়তাবাদী দখলদারিত্ব বজায় রাখা সেটা তালুকদার পাড়াসহ অন্যত্র সেনা ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে এবং শান্তিবাহিনীর বিলুপ্তি সত্ত্বেও সেনা প্রত্যাহার না করার ফলে সুস্পষ্ট হয়েছে।

সেনা বাহিনী কর্তৃক ২ পিসিপি সদস্য গ্রেফতার

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ২৮ আগষ্ট ২০০৪ বিকেল ৩টার দিকে খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাইসছড়ি আর্মি ক্যাম্পের মেজর আলম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দুই কর্মিকে অন্যায়ভাবে আটক করে। এরা হলেন পিসিপি খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির অর্থ সম্পাদক অভিলাষ চাকমা ও সদস্য চেনু মং মারমা। চেনু মং মারমার গ্রামের বাড়ি ঘুঙুরোছড়ি, জেটিপাড়া।

জানা যায়, ঘটনার দিন অভিলাষ চাকমা মাইসছড়ি বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে মেজর আলম ও তার সৈন্যরা তাকে আটক করার পর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে বেদম মারধর করা হয়। সেনারা তার কাছ থেকে জোরপূর্বক এই মর্মে স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টা চালায় যে, সে ও চেনু মং মারমা এলাকায় সন্ত্রাসী কাজের সাথে জড়িত। কিন্তু অনেক অত্যাচারের পরও সেনারা তাদের কাছ থেকে তা আদায় করতে ব্যর্থ হয়। পরে তাদেরকে মহালছড়ি থানার পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তারা এখনো আটকাধীন আছেন।

শেষের পাতা

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের ১ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

২৪ অক্টোবর জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের ১ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার তাজুল মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের নেতা ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ মোর্চার নেতা শিবলী কাইয়ুম, ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর প্রধান প্রসিত খীসা। গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের অপর নেতা হাসিবুর রহমান প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রচারিত ঘোষণাপত্র পড়ে শোনান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম।

"জাতীয় মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও তাবেদার শাসক শ্রেণী বিরোধী বামপন্থী ঐক্য গড়ে তোল" শিরোনামে প্রচারিত জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের আহ্বানে বলা হয়, "বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর একটি মস্ত দুর্বলতার দিক হলো, এর প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে এমন শত্রুতামূলক সম্পর্ক যা এদেরকে শ্রেণীগতভাবে জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে যথাযথভাবে সচেতন হতে দেয় না। শ্রেণী স্বার্থকে দলীয় স্বার্থের ওপরে উঠে দেখার ক্ষমতা এদের নেই। এটাই ইউরোপীয় এবং আমেরিকান বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর সাথে তো বটেই, এমনকি ভারতীয় বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর সাথে বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর একটা বড়ো পার্থক্য।

"প্রশাসন, পুলিশ, মিলিটারীসহ সকল প্রকার বলপ্রয়োগকারী সংস্থা, আদালত, প্রচার মাধ্যম এবং অর্থনৈতিক শক্তি সবকিছু সত্ত্বেও এই শাসক শ্রেণী দেশের কোন সংকটজনক পরিস্থিতি ঠিকমত মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। অর্থনীতি ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি ও লুণ্ঠন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সন্ত্রাস, বিচার ব্যবস্থা, বন্যা পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কোন কিছুই আজ এদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তেমন নেই। বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে মনে হয়, সব কিছুই এক গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে।

"বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থার সব থেকে হাস্যকর দিক হলো, নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদ একটি সরকার গঠন করার পর থেকেই বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জন এবং প্রায় সাথে সাথেই নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী। এই দাবীর কোন প্রকৃত গণভিত্তি না থাকায় বিরোধী দলের শত চীৎকার সত্ত্বেও প্রত্যেক বারই জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রীসভা তাদের মেয়াদ পূর্ণ করার পরই নতুন নির্বাচন হয়।

"বাংলাদেশের সংসদীয় বামপন্থীদের অবস্থান ও অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, বিগত এক বছরে এদের মধ্যে, বিশেষতঃ এদের জোট বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের সব থেকে লক্ষ্যণীয় দিক হলো, বামফ্রন্ট এবং এগারো দলের অস্তিত্ব বিলুপ্তির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। এদের জোটগত আন্দোলনের কর্মসূচী বলেও এখন আর কিছু নেই।

"বর্তমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে আমরা যে গণ-অভ্যুত্থানের বাস্তব সম্ভাবনা দেখি তার নেতৃত্ব যাতে আর শাসক শ্রেণীর কোন অংশের হাতে না গিয়ে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের হাতেই আসে, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী ১৮ দফা প্রণয়ন করেছি ও তার বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করছি। এই পথে রাজনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান শর্ত হলো, সংসদীয় নির্বাচনের পথ বর্জন করে জনগণকে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত ও পরিচালনা করা। জনগণের শক্তিকে জাগ্রত করা। জনগণই প্রধান শক্তি, কাজেই এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এগিয়ে আসা ও সংগঠিত হওয়ার জন্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি ও জনগণের কাছে আমরা আহ্বান জানাই"

ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহের ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ - ১৮ অক্টোবর তিন দিন ব্যাপী ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহের মধ্যে ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভা চট্টগ্রামের স্টুডিও থিয়েটার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ এর আহ্বায়ক প্রসিত বিকাশ খীসা। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ এর কেন্দ্রীয় সদস্য রবিশংকর চাকমা, ধ্রুবজ্যোতি চাকমা, সচিব চাকমা, রুই খুই মারমা ও পার্টিতে সদ্য যোগদানকারী সদস্য ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী নেতা নতুন কুমার চাকমা; পাহাড়ি যুব ফোরামের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে অপু চাকমা ও দীপংকর চাকমা; হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সোনালী চাকমা ও অন্তরিকা চাকমা; পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি মিঠুন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক অলকেশ চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা সহ আরো অনেকে।

ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত খীসা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশীয় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার দেশটাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। দুর্নীতি ছাড়া সরকার আর কোথাও ভালো ফল করতে পারেনি। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধিতে সাধারণ জনগণের নাভিঃশ্বাস উঠছে।

তিনি র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাবের সমালোচনা করে বলেন, সন্ত্রাস দমনের নামে এটি নিজেই একটি সন্ত্রাসী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তিনি র‍্যাবকে ক্রিমিন্যাল ইন ইউনিফরম বা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর পোষাকধারী ক্রিমিন্যাল হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন, সরকারকে অবশ্যই র‍্যাবের কার্যকলাপের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। ক্রসফায়ারে মৃত্যু হয়েছে বললেই র‍্যাবের দায়িত্ব খালাস হয়ে যেতে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, চুক্তি পূর্ব ও চুক্তি উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির

৪র্থ পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে প্রতিরোধ দিবস পালিত

৩০ অক্টোবর খাগড়াছড়িতে পালিত হলো প্রতিরোধ দিবস। এ উপলক্ষ্যে জেলার স্বনির্ভর বাজারে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পিসিপি জেলা শাখার সভাপতি পুলক চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সমন্বয়কারী ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সচিব চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় নেতা সর্বোত্তম চাকমা, কাহ্লাচিং মারমা ও অংগ্য মারমা। সমাবেশটি পরিচালনা করেন অনি বিকাশ চাকমা।

সমাবেশের পূর্বে মিছিল বের করার উদ্যোগ নিলে পুলিশ বাধা দেয়। এর প্রতিবাদে ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিট ও সহযোগী সংগঠনগুলো খাগড়াছড়িতে ১ নভেম্বর অর্ধ দিবস সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে। ১৯৯৩ সালের ৩০ অক্টোবর খাগড়াছড়ির খেজুর বাগানে পুলিশ পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর নেতা কর্মিদের ওপর বিনা উস্কানিতে হামলা চালায় ও লাঠি চার্জ করে। এতে অনেকে আহত হন। পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ পরে এই পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুললে প্রশাসন আটককৃতদের বিনা শর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা লক্ষ্য করুন:

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুকদেরকে সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে। আগ্রহীরা নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন:

সুনির্মল চাকমা, রুম নং ২৩৯, নবাব আব্দুল লতিফ হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

শিক্ষাসংক্রান্ত ৮ দফা দাবিতে পিসিপি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংবাদ সম্মেলন

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত ৮ দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। পিসিপি নেতৃবৃন্দ গত ৭ অক্টোবর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটারিয়ায় অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পিসিপি-রাবি এর সাধারণ সম্পাদক রিকো চাকমা ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন পিসিপি রাবির সভাপতি সুনির্মল চাকমা ও পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি রূপন চাকমা।

পিসিপি নেতৃবৃন্দ তাদের দফা দাবি তুলে ধরার পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতিও উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সেনাবাহিনীর দমন পীড়ন ও অব্যাহত ভূমি বেদখল পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা উপস্থিতি জায়েজ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অপারেশন উত্তরণের মাধ্যমে সেনাছাউনি বাড়ানো হচ্ছে। সেনা বাহিনী নানা অজুহাতে নিরীহ লোকজনকে গ্রেফতার করছে, শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে ও তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ঝুলিয়ে দিচ্ছে। চা চাষ, কমলা চাষ, রাবার বাগান ইত্যাদি প্রকল্পের নাম দিয়ে নিরীহ জুম্ম জনগণকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া চলছে। খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ির হাতিমুড়া (ছাং খাং দং) এলাকার পাশে চার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ওয়াদুদ এর নামে ওয়াদুদ পল্লী গঠন করা হয়েছে। মানিকছড়ির বড়পিলাক এলাকাতেও জুম চাষের প্রায় এক হাজার একর জমি দখল করা হয়েছে। রামগড় সাপছড়ি ইউনিয়নের তৈকরমা মৌজার সনহল পাড়া ও রিয়ম মরম পাড়ার পাহাড়ি জনগণের প্রায় ৫ শত একর পরিমাণ জমিতে জোরপূর্বক চা, কফি ও কমলা চারা লাগানো হয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি অভিযোগ করে লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেলেও দেশের অন্যান্য জাতিসত্তাগুলো তাদের নিজ মাতৃভাষায় পড়ালেখার সুযোগ পায় না।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সম্পাদিত পার্বত্য

সংবাদ সম্মেলনে পিসিপি নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখছেন ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

চুক্তিসম্পর্কে বলা হয়, এ চুক্তির মাধ্যমে কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থ নিশ্চিত করে বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক শুন্যতা পূরণের লক্ষ্যে জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে যখন আবির্ভূত হয় এবং অতি অল্প সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে তখনই শাসক গোষ্ঠি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা এবং প্রপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। জাতিসত্তার অধিকার মেনে নিয়ে জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা ও জাতিসত্তাসমূহের নিজ ভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার মেনে নেয়া, অবিলম্বে সেনা অপারেশন উত্তরণ বন্ধ করা, পাহাড়িদের জায়গা জমি বেদখল বন্ধ করা ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জায়গা জমি ফিরিয়ে দেয়া, মেডিক্যাল-বিআইটি-কৃষি কলেজ সমূহের পাহাড়ি কোটাগুলো সেনা নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা, শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে কোটা সুবিধা বৃদ্ধি করা ও শিক্ষা সংক্রান্ত পিসিপির ৫ দফা বাস্তবায়ন করা।

জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের ফ্যাসিস্টসুলভ আচরণের কড়া সমালোচনা করা হয় সন্তু লারমার প্রতি নিম্নোক্ত আহ্বান জানানো হয়: এক. শাসক গোষ্ঠির নীল নকসা অনুযায়ী ইউপিডিএফ নির্মূলের কর্মসূচী প্রত্যাহার করা, দুই. পাহাড়ি যুব সমাজকে ধ্বংসাত্মক পথে ঠেলে না দেয়া, তিন. আঞ্চলিক পরিষদের গদি ছেড়ে দিয়ে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সামিল হওয়া।

পিসিপি নেতৃবৃন্দ তাদের পেশকৃত ৮ দফা দাবি সম্পর্কে বলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিগত কয়েক বছর স্মারকলিপি দিয়ে আসছে। কিন্তু প্রশাসন তার কোন গুরুত্ব দেয়নি। আদিবাসী উপজাতি কোটার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় প্রতি বছর ভর্তি সংক্রান্ত জটিলতার সৃষ্টি হয়। অনেকে ভর্তি হওয়ার যোগ্য হলেও ভর্তি হতে পারছে না। প্রতি বছর ভর্তির জন্য কমিটি করা হয় বলে ভর্তির নিয়মও প্রতি বছর একই থাকে না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে ২৫-২৬ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে সেখানে আদিবাসী-উপজাতি কোটায় মোট কুড়িটি আসন রয়েছে যা শতকরা হিসেবে মাত্র .০৮ ভাগ।

নেতৃবৃন্দ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে দুটি করে আসন বরাদ্দের দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনের আগে পিসিপি নেতৃবৃন্দ ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস উপলক্ষে উপাচার্যের বরাবরে আট দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। তাদের অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে আশ্বাস বানী শোনানো হলেও কার্যক্ষেত্রে তাদের দাবি পূরণ করা হয় না।

পিসিপি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পেশকৃত ৮ দফা দাবি হলো: আদিবাসী-উপজাতি কোটার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা, আদিবাসী-উপজাতি কোটায় বিষয়ভিত্তিক ২টি আসন বরাদ্দ করা, আদিবাসী ও উপজাতি কোটা পৃথক করা, উচ্চতর গবেষণা ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা, আদিবাসী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ শিক্ষাবৃত্তি চালু করা, কোট সংক্রান্ত কার্যক্রম ক্লাশ শুরুর আগে সম্পন্ন করা, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হতে ভর্তিকৃত সকল ছাত্রছাত্রীকে নির্দিষ্ট ছাত্রাবাস বা হলে সংযুক্তি প্রদান করা, আদিবাসী উপজাতি কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীকে ১ম বর্ষে আবাসিকতা প্রদান করতে হবে।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ২০১, ড. কুদরত-ই-খুদা হল (পুরাতন), বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারিবাগ, ঢাকা - ১২০৯